কুরআনের সৌন্দর্য

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

৯	শুরুর আগে
১৪	আলহামদুলিল্লাহ
১৭	রহমান ও রহীম
২০	হরফ যত অর্থ তত!
২৪	ক্ষমার রকমফের
২৭	নানান রকম স্ত্রী!
৩১	ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু!
৩৭	বহুর মাঝেও একক তিনি
৪২	সু-বছর ও কু-বছর
৪৫	শব্দচয়নের সচেতন নমুনা
৪৭	আল-কুরআন ও আল-কিতাব
৫১	‘ফিতনা’ দেখে ফিতনায় পড়বেন না
৫৭	সফলতা
৫৯	বাতাস সমাচার
৬৯	রব্বি ও রব্বানা এর রহস্য কথা
৭১	জান্নাত ও জাহান্নামের দরজা
৭৪	মূসা ﷺ-এর লাঠি এবং সাপ
৭৬	দুইটি অঙ্গের অসাধারণ উপস্থাপনা
৭৮	কুরআনের ইজায বা সু-সংক্ষিপ্ততা
৮০	ঘন মেঘের ভারি বর্ষণ

৮৩ জীবনের সারসংক্ষেপ
৮৫ মা-বাবার প্রতি সদাচার
৮৯ যিকর ও তাসবীহ
৯৩ শব্দের অর্থে উচ্চারণের প্রভাব
৯৫ সবর : অনন্য সৌন্দর্যের উপমা
৯৮ সম্মান ও অসম্মানের সমতা বিধান
১০১ স্থায়ী সম্পদ
১০৩ স্থান-কাল-পাত্রের দাবি পূরণ
১০৫ কবরের যিয়ারত
১০৭ সীরাতে মুস্তাকীম
১১০ শব্দ প্রয়োগে যথার্থতা
১১৪ হুকুম ও ফয়সালায় কুরআনীয় ফারাক
১১৮ ভীতিপ্রদর্শনকারী
১২০ চমৎকার একটি সামঞ্জস্যতা
১২২ নেকড়ের খাওয়া
১২৫ সূরার ধারাবিন্যাসে ক্রিয়ার ধারাবিন্যাস
১২৭ তাসবীহ-পাঠের রহস্য
১৩০ শব্দ ব্যবহারের কারিশমা
১৩২ ‘আল্লাহ’ শব্দের উপাদান
১৩৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

শুরুর আগে

কুরআনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় এর ইজাযকে। এর শাব্দিক অর্থ কাউকে অক্ষম বা অপারগ করে দেওয়া। পরিভাষায় ইজায বলা হয় মানুষ ও জিনদের পক্ষে কুরআনের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসার অক্ষমতাকে। হোক সেটি পুরো কুরআন কিংবা কুরআনের কোনো সূরা। এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন কারীমে তিনটি ধাপে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। পরেরটা আগের তুলনায় অধিকতর সহজ। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা কঠিন চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পর সেটা গ্রহণে মানব ও জিনকুল অক্ষম হওয়ার পর তা আরেকটু সহজ করা হয়। এভাবে সর্বনিম্ন সহজ করে দেওয়ার পরেও মানুষ বা কোনো জিনের পক্ষে তা আজ অবধি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

প্রথমে সমগ্র কুরআনের অনুরুপ কিছু রচনা করার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলা হয়েছে,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

> **‘(হে নবি) আপনি বলে দিন, মানুষ ও জিনেরা যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ তৈরি করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা তার অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করতে পারবে না।’**[১]

তা গ্রহণে কেউ সক্ষম না হওয়ায় দ্বিতীয় ধাপে বলা হয়েছে,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

> **‘না কি তারা বলে যে, এই কুরআন সে (মুহাম্মাদ) নিজে বানিয়েছে?**

[১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৮।

> **আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আনো এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে লও।'**[২]

যখন কেউ এটিও গ্রহণ করতে পারল না, তখন বিষয়টাকে আরও সহজ করে বলা হলো,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

> **'আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি (অর্থাৎ কুরআন) সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (নিজেরা) তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'**[৩]

কিছু মানুষ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করলেও কেউ তাতে সফল হয়নি। এই বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যবহুল বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি 'কুরআন বোঝার মজা' বইতে। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে বিষয়টি দেখে নিতে পারেন।

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের মূল বিষয়টি শুধু ভাষাগত ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। আবূ বকর বাকিল্লানী ﵀ তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪] অন্যান্য মনীষীরা নিজস্ব গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার আলোকে নানাবিধ ভাগ করেছেন। তবে সবগুলোকে সামনে রাখলে কুরআনের ইজাযকে মোটাদাগে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যায়।

১. ভাষা, বর্ণনা ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য

এর মধ্যে আছে কুরআনের সূক্ষ্ম শব্দচয়ন, বাক্যে সেগুলোর নান্দনিক বিন্যাস ও যথাস্থানে এর যথার্থ ব্যবহার। উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাক্যমালার মাধ্যমে কুরআনের প্রতিটি সূরাকে অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দেওয়া, যার মোকাবিলা করা কোনো জিন ও ইনসানের সাধ্যের অতীত।

---

[২] সূরা হুদ, ১১ : ১৩।

[৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩।

[৪] ইজাযুল কুরআন, বাকিল্লানী, ৬২।

২. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

কুরআন যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হয়ে অতীতের বিভিন্ন ঘটনার নির্ভুল বয়ান করেছে, তেমনি অনাগত দিনের বহু বিষয় বলে রেখেছে। কিছু বাস্তব হয়ে গিয়েছে, বাকিগুলো ঘটমান এবং চিরকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকবে। যেমন : রোম-পারস্যের লড়াইয়ে তৎকালীন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কুরআন জানিয়েছিল রোমরা পরাজিত হবে। হয়েছিলও তাই। আবূ লাহাব ইসলাম আনবে না—এ কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধে কাফিরগোষ্ঠী লেজ গুটিয়ে পলায়ন করবে—কুরআন আগেভাগেই বলে দিয়েছিল। হয়েছিলও তাই। এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে।

৩. জ্ঞানগত বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা

কুরআন মূলত ধর্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এতে ধর্মীয় আদেশ-উপদেশের বাইরে আল্লাহর অস্তিত্ব, নিয়ামাত ও সৃষ্টি-কুশিলতার বিবরণ দিতে দিয়ে এমন সব তথ্যের সন্ধান দিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান তার উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে যা আজকে মাত্র অনুধাবন করতে শুরু করেছে। অথচ কুরআন যে যুগে এসব আলাপ সেরে ফেলেছে সেই যুগে কারও তা জানার কথা নয়।

৪. জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন

কুরআন মানুষের জীবন চলার পথে যে নির্দেশনার দরকার তার মৌলিক নীতিমালাগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রদান করেছে। জীবনের হেন কোনো বিষয় নেই যেই সংক্রান্ত মূলনীতি আপনি এতে পাবেন না। এবং প্রতিটি বিধান অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শী। যতই এর গভীর থেকে গভীরে গিয়ে চিন্তা করা হবে, ততই মানবজাতির জন্য তার যৌক্তিকতা, কল্যাণকামিতা ও উপযোগিতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হবে।

৫. হৃদয়ের গহীনে প্রভাব বিস্তারকারী

কুরআনের অনন্য দিক হচ্ছে, এর পাঠ একজন পাঠকের মনে এক ধরনের তন্ময়তা সৃষ্টি করে। তার হৃদয়-সমুদ্রে তোলে আবেগ-অনুভূতি আর ভাবালুতার ঝড়। পাঠের মিষ্টতার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে অন্তরের প্রতিটি গলি-ঘুপচিতে। একেকটি আয়াতের ছোঁয়া তার তনুমনে বুলিয়ে দেয় অন্য রকম শান্তির পরশ। এর প্রভাবেই যুগেযুগে বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে সম্মানিত করেছে। এমনটা দুনিয়ার অন্য কোনো গ্রন্থে বিরল।

এই পাঁচ প্রকার কোনো সুনিশ্চিত প্রকার নয়। কারও কারও লেখাতে এরচেয়ে কমবেশ থাকতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা বা বিরোধ নেই। যেহেতু পুরো বিষয়টিই বিবেচনা ও গবেষণা নির্ভর। এই বইতে কুরআনের ইজাযের প্রথম প্রকার তথা ভাষা, বর্ণনা ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিক্ষিপ্তভাবে নানান আয়াত থেকে কুরআনের ভাষা ও উপস্থাপনাগত সৌন্দর্য তুলে ধরেছি পাঠকসমীপে।

কুরআনের ইজাযের আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ নানা রকম সংখ্যাতত্ত্বকে হাজির করেন। যেমন, কেউ কেউ ১৯ সংখ্যাকে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন। কুরআনের ইজায বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে 'আল-ইজাযুল আদাদী' নামে সাধারণত তা আলোচিত হয়ে থাকে। এটি মোটেই গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় নয়। তাই উক্ত গ্রন্থে এমন কোনো আলোচনা স্থান পায়নি।

এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলো বিভিন্ন আরবি বই-পুস্তকের সহায়তায় আহরণ করা। কিছু আছে একান্তই আমার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত। আমার প্রতিষ্ঠিত অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান *'নূরুল কুরআন একডেমি'*[৫] এর সাপ্তাহিক তরজমাতুল কুরআন ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরের দারস করাতে গিয়ে কুরআনের অনেক সৌন্দর্যের বিষয় মাথায় এসেছে। পরে তা লিখিত আকারে রূপ দিই। বইটির শেষে আমি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা দিয়ে দেব। যাতে করে আহলে ইলমগণ চাইলে এই বিষয়ে আরও ব্যাপক পড়াশুনা করতে পারেন।

বাংলাভাষায় কুরআনের ভাষা ও উপস্থাপনাগত সৌন্দর্য নিয়ে মৌলিক বইপত্র নেই বললেই চলে। দুই-তিনটা ভিনদেশি বইয়ের অনুবাদ থাকলেও সেগুলো সাধারণ পাঠকের এই বিষয়ে পাঠতৃষ্ণা মিটানোর জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তাছাড়া সেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য কুরআনের সৌন্দর্য অনুধাবনে কতটুকু বোধগম্য তা নিয়েও কথা আছে। আশা করি এই বইটি উক্ত অভাব পূরণে কিছুটা হলেও সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজটি কবুল করে নিন। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার সেই সকল উস্তাযদেরকে, যাদের নিদারুণ পরিশ্রম, যত্ন ও পুত্রতুল্য স্নেহ-মায়ার কারণে টুকটাক আরবি ভাষা শিক্ষা করতে পেরেছি ও আরবি বিভিন্ন বইপত্র ও লেকচার থেকে ইলমি মণিমুক্তা আহরণ করার তাওফিক হচ্ছে।

---

[৫] *নূরুল কুরআন একাডেমি* সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করতে পারেন একাডেমির ওয়েবসাইটে- academy.nlquran.com অথবা চোখ বুলাতে পারেন ফেসবুক পেইজে- https://www.facebook.com/NLQURAN

আল্লাহ তাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠক, আর বেশি কথা বাড়াব না। আপনাকে এখনই নিয়ে যাব কুরআনের সৌন্দর্যে অবগাহন করার প্রাঙ্গণে। সেখানে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে, তবে অবশ্যই আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। আমরা তা যথাসাধ্য সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা সায়্যিদিনা ওয়া হাবীবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ; ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১৮ রবিউস সানী ১৪৪৩ হিজরি
২৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

আলহামদুলিল্লাহ!

'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যটা আমরা জীবনে কত শত বার যে উচ্চারণ করেছি তার কোনো হিসাব নেই। যেকোনো ভালো কিছু ঘটলেই আমাদের মুখ দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বের হয়ে আসে। যিকর হিসেবে এটি অসংখ্যবার মুখ দিয়ে আওড়াই। এসব যদি না-ও হয়, অন্তত সূরা ফাতিহা পড়ার সময় অবশ্যই এটি উচ্চারণ করতে হয়। আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এর অর্থ কী? বলবেন—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হ্যাঁ, এটিই এই বাক্যের সাধারণ তরজমা। কিন্তু এই লেখাতে আমরা একে আরেকটু গভীর থেকে তলিয়ে দেখব। আরবি ভাষার সৌন্দর্যের দূরবীন দিয়ে এর ভেতরকার রূপ-রস-ঘ্রাণের সাথে পরিচিত হব।

এই বাক্যটি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের প্রথম অংশ। এর শুরুতে যে 'আল' আছে একে বলা হয় 'আল জিনসী'। অর্থাৎ এটি যার শুরুতে এসে যুক্ত হয় তার গোটা শ্রেণিটাকে বুঝিয়ে থাকে। এখানে এটি এসেছে 'হামদ' তথা প্রসংশার শুরুতে। সুতরাং, দুনিয়া-আখিরাতের বুকে সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে শেষ অবধি যত প্রসংশা হতে পারে সবকিছুকে এটি অন্তর্ভুক্ত করছে। সেজন্যই খেয়াল করলে দেখবেন বাংলাতে তরজমা করা হয়েছে—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই 'সমস্ত' কথাটা তরজমাতে বাড়িয়ে দেওয়ার মূল কারণ হলো এটি।

বান্দার পক্ষে কখনো সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর সকল প্রশংসা বলে শেষ করবে। সূরা কাহফে বলা হয়েছে, যদি সমুদ্রের পানিগুলো কালি হয় আর জমিনের গাছগুলো কলম হয় তবুও আল্লাহর সকল প্রশংসার উল্লেখ কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না; এর আগেই সমুদ্রের পানি ফুরিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! সেজন্যই সহজ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে এখানে। এক শব্দে বলে দেওয়া হলো—সমস্ত প্রশংসা। এবার চাই এর পরিমাণ যত ব্যাপক ও বিস্তৃতই হোক না কেন।

এবার আসা যাক 'হামদ' (حمد) শব্দটিতে। এর অর্থ প্রশংসা। আরবি ভাষায় প্রশংসার জন্য সাধারণত দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি হলো হামদ, অপরটি

মাদহ (مدح)। দুইটার অর্থ যদিও একই, তবুও উভয়ের ভেতর কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। যেই কারণে কুরআনে আল্লাহর প্রশংসার জন্য এই শব্দটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি জায়গায় আল্লাহর প্রশংসার উল্লেখ করতে গিয়ে একে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা 'হামদ' শব্দটির বৈশিষ্ট্য জানব এবং দেখব, এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য করা বান্দার প্রসংশা কত বেশি বিস্তৃত ও গভীর।

এক. 'হামদ' শব্দটির মাধ্যমে কেবল জীবিত সত্ত্বার প্রশংসা করা হয়। মৃত কারও প্রসংশা এর মাধ্যমে করা হয় না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা জীবিত। তিনি মারা যাননি, কখনো যাবেনও না। মৃত্যু নামক ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। পক্ষান্তরে 'মাদহ' শব্দটি জীবিত-মৃত সকলের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

দুই. আমাদের প্রশংসাগুলো দুই ধরনের হয়। প্রথম হলো, প্রশংসার সাথে ভক্তি-মুহাব্বাত-ভালোবাসা ইত্যাদির মিশ্রণ থাকে। যেমন কেউ বলল, 'অমুক ব্যক্তি অনেক বড় আলিম এবং তাকওয়ার অধিকারী। তাঁর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে যদি ইলম অর্জন করতে পারতাম!' এই প্রশংসাটি কেবলই প্রশংসা নয়, বরং এর সঙ্গে ভক্তি ও ভালোবাসাও মিশে আছে। পক্ষান্তরে কেউ বলল, 'আমেরিকা বর্তমান বিশ্বের সুপার পাওয়ার। তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।' এটাও প্রশংসা করা হলো। কিন্তু এই প্রশংসার ভেতরে ভালোবাসা কিংবা ভক্তির লেশমাত্র নেই। 'হামদ' বলা হয় এমন প্রশংসাকে, যার মধ্যে ভক্তি-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা এবং সম্মানের মিশ্রণ থাকে। কিন্তু 'মাদহ' এর মধ্যে এগুলো থাকা জরুরি নয়। তাই 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে বান্দা বুঝায়, তার করা আল্লাহর প্রশংসার মধ্যে ভক্তি-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-সম্মান এবং মর্যাদাপ্রদান করার মতো বিষয়গুলো বিদ্যমান। এই প্রশংসা কোনো বানোয়াটি প্রশংসা নয়। কারণ, অনেক সময় মানুষ মুখে মুখে প্রশংসা করে থাকে। যেমন : রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা হলে কিছু দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলের জন্য মুখে মুখে তার গুণগান গায়। কিন্তু সে প্রস্থান করলেই আড়ালে গালি দিয়ে বসে। এই ধরনের প্রশংসার মধ্যে ভালোবাসা কিংবা সম্মান থাকে না। বান্দা যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলছে তখন এর মাধ্যমে সে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আমার এই স্তুতিবাক্য এবং গুণগান লৌকিকতামুক্ত।

তিন. যেকোনো জিনিসের প্রশংসা করা হয় তার গুণের কারণে। এই গুণ আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম হলো, যা নিজের ইচ্ছায় অর্জিত। দ্বিতীয় হলো, যা অর্জন হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কোনো ভূমিকা ছিল না; এমনিতেই তা অর্জিত হয়েছে। 'হামদ' এর মাধ্যমে প্রথম প্রকারের গুণের জন্য করা প্রশংসা বোঝানো হয়। ধরুন, কোনো একটি ফুল দেখে আপনি বললেন, 'ফুলটি কী সুন্দর!' এই যে আপনি ফুলটির প্রশংসা করলেন তার সৌন্দর্য অবলোকন করে,

এই গুণটি কিন্তু ফুলের স্বেচ্ছায় অর্জিত নয়। তার ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই এর পেছনে। এমন না যে, ফুলটি যদি চাইত তাহলে নিজের সৌন্দর্যে সে কমবেশ ঘটাতে পারত। তাই ফুলের জন্য করা আপনার এই প্রশংসাকে 'হামদ' বলা যাবে না। বরং একে 'মাদহ' বলতে হবে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, বান্দা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এই বিষয়েরও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী অনিচ্ছায় অর্জিত কোনো জিনিস নয়। বরং এগুলো তাঁর ইখতিয়ারাধীন।

চার. অনেক সময় কেউ যখন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে বা আমাদের কোনো উপকার করে, তখন আমরা তার প্রশংসা করি। এই প্রশংসাটি হয়ে থাকে ইহসান বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়ার পর। এর সাথে নিজের পাওয়া ও না-পাওয়ার একটা সম্পর্ক থাকে। মানে, উপকার পেলে প্রশংসা করব; না পেলে করব না। কিন্তু 'হামদ' এর মাধ্যমে এমন প্রশংসা বুঝানো হয়, যার পূর্বে কোনো অনুগ্রহ থাকা জরুরি নয়। সুতরাং, বান্দা যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তখন এর মাধ্যমে সে আসলে বোঝায়, আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ামাত দান করেন তবুও আমি তাঁর প্রশংসা করি—আলহামদুলিল্লাহ! আর যদি তিনি আমাকে কোনো বিপদে আক্রান্ত করেন, আমার ওপর কোনো মুসিবত চাপিয়ে দেন তখনো আমি তার প্রশংসা করি—আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় আমি তাঁর গুণগান গাই।

পাঁচ. 'আলহামদুলিল্লাহ' এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আরও বুঝানো হয় যে, আল্লাহর জন্য এই প্রশংসা অস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। কারণ, এই বাক্যটির মূল রূপ হলো, 'আহমাদুল্লাহা' (الله أحمد) বা আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। এটাকে ফেয়েল (verb) বা ক্রিয়া থেকে সরিয়ে ইসিম (noun) তথা বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণে একে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে ফে'লিয়া বলে। এভাবে পরিবর্তন করে বলার ফলে প্রশংসাটা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। কারণ, ক্রিয়ার মধ্যে স্থায়িত্ব পাওয়া যায় না। যেকোনো কাজই কর্তা কিছুক্ষণ করার পর সাময়িকের জন্য হলেও বিরতি দেয়। তখন তার স্থায়িত্ব বহাল থাকে না। ক্ষণিকের জন্য হলেও তাতে ভাটা পড়ে। সুতরাং, আয়াতে এভাবে ক্রিয়ার পরিবর্তে বিশেষ্যপদের আকারে বাক্যটাকে নিয়ে আসার ফলে প্রসংশাটা আল্লাহর জন্য বিরতিহীনভাবে সব সময়ের জন্য সাব্যস্ত হলো।

একজন বান্দা যখন এত গভীর ও বিস্তৃত আকারে আল্লাহর প্রশংসা করে, তাঁর গুণগান গায় তখন আল্লাহর এমনিতেই খুশি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা এতটা ব্যাপক অনুভব-অনুভূতি নিজের ভেতর ধারণ করে কয়জনই-বা আল্লাহর জন্য বলি—আলহামদুলিল্লাহ!

রহমান ও রহীম

রহমান ও রহীম শব্দ দু'টি গঠিত হয়েছে আরবি 'রহমত' থেকে। রহমত অর্থ দয়া। সে হিসেবে বাংলাতে রহমান ও রহীমের অনুবাদ করা হয় পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। এই দুইটি শব্দই আল্লাহর গুণবাচক নাম। 'বাসমালাহ' তথা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম ও সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর এই দুইটি গুণ পাশাপাশি এসেছে। প্রশ্ন হতে পারে, উভয় শব্দই যেহেতু একই শব্দমূল থেকে এসেছে এবং প্রায় একই ধরনের অর্থ প্রকাশ করছে, তাহলে একটা শব্দকে ব্যবহার করলেই তো হতো। এতে করে অহেতুক বাহুল্য থেকে মুক্তি পাওয়া যেত।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়। বরং একই মূল থেকে আসায় শব্দ দু'টির অর্থ কাছাকাছি হলেও উভয়ের অর্থের মাহাত্ম্য ভিন্নরকম।

পার্থক্য নিয়ে কথা বলার আগে একটা আরবি নীতি জেনে নিই। তা হলো, কাসরাতুল মাবানী তাদুল্লু আলা কাসরাতিল মাআনি। অর্থাৎ, অক্ষর-সংখ্যা বেশি হলে তা অধিক অর্থ বুঝিয়ে থাকে। এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, রহমান শব্দের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যা হলো পাঁচটি। আর রহীমের মধ্যে হলো চারটি। তাহলে উপরেল্লিখিত নিয়মের আলোকে আমরা বলতে পারি, রহমান শব্দটি রহীমের তুলনায় দয়ার অর্থটি অধিক মাত্রায় প্রকাশ করছে।

অধিক মাত্রার চিত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি। তা হলো, অধিকাংশ আলিমের মতে 'রহমান' শব্দটি ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবরা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহার করত না। সেজন্যই আয়াতে এসেছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰن

> **'যখন তাদেরকে বলা হলো–তোমরা রহমানকে সিজদাহ করো; তারা বলল, রহমান আবার কী জিনিস?'**[৬]

[৬] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬০।

এই কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে তথা মাক্কী সূরাগুলোতে 'রহমান' শব্দটার উপস্থিতি অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। সূরা মূলক মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা 'রহমান' শব্দটি প্রায় আটবার ব্যবহার করেছেন। যাতে করে বারবার আলোচিত হবার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে বিষয়টি গেঁথে যায় এবং এটি যে আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম তা সবার কাছে পরিচিত ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

এর বাস্তবতা আমরা এভাবে দেখি, মক্কায় সূরা মূলক নাযিল হবার সময় আল্লাহ তাআলা বলছেন,

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ

'রহমান ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না।'[৭]

একই রকম কথা যখন মাদানী যিন্দেগীতে নাযিল হলো, তখন এভাবে বলা হলো,

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ

'আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না।'[৮]

কারণ এত দিনে মানুষের অন্তরে এই নামটি আল্লাহর হবার বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

'রহমান' শব্দের মধ্যে দয়ার অর্থ অধিক পাওয়ার বিষয়টি বুঝার জন্য আমরা দুনিয়ার মানুষদের উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারি। এদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই ধরনের মানুষজন রয়েছে। আল্লাহ সবার প্রতিই দয়া করছেন। সেজন্যই যারা আল্লাহকে এককভাবে নিজের রব ও স্রষ্টা বলে স্বীকার করে না, তাদেরকেও আল্লাহ না খাইয়ে রাখেন না। জীবনভর আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামাত ভোগ করে তারা। একজন মুমিনের বাগানে এবং ক্ষেতে যেমন ফলমূল ও শস্যাদি ফলে, তেমনি একজন আল্লাহদ্রোহী নাস্তিকের বাগানে এবং ক্ষেতেও ফল আসে, ফুল ফোটে এবং শস্যাদি জন্মায়। বরং বর্তমান সময়ে সম্পদের বিচারে তারাই বেশি এগিয়ে, যারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান রাখে না। দুনিয়াতে আল্লাহর যে দয়া, এটি কাফির-মুসলিম সবার প্রতি বিস্তৃত। এই ধরনের দয়ালু বোঝানোর জন্যই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অথচ আমরা আখিরাতের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখব, সেখানে কাফিরদের প্রতি কোনো দয়া নেই। তারা রহমানের রহম থেকে বঞ্চিত। তখন আল্লাহর দয়া

[৭] সূরা নাহল, ১৬ : ৭৯।

[৮] সূরা মূলক, ৬৭ : ১৯।

কেবল তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্য বরাদ্দ। এই সময়ে তিনি রহীম, রহমানের মতো সর্বব্যাপী নন। তখন তিনি আদরে রাখবেন শুধু তাঁর প্রিয়দের।

এদিক বিবেচনায় আল্লাহ রহীম। এই শব্দটিতে থাকা রহমতের বিষয়টি ব্যাপক আকারে নয়, একটু নির্দিষ্ট পরিসরে কেবলই মুমিনদের জন্য।

বিসমিল্লাহ কিংবা সূরা ফাতিহাতে রহমানকে আগে আনা হয়েছে, রহীমকে পরে। কারণ, আল্লাহর ব্যাপক দয়া তথা 'রহমান' শব্দের বাস্তবায়ন দুনিয়াতে ঘটছে। পরবর্তীতে আখিরাতে সীমাবদ্ধ দয়া তথা রহীমের বাস্তবায়ন ঘটবে।

এর মধ্যে দুনিয়াবাসীর জন্য এই বার্তা রয়েছে যে, ব্যাপক দয়ার যুগে সবার উচিত আল্লাহর দয়ার নিচে আশ্রয় নেওয়া। অন্যথায় পরকালে যখন দয়া সীমিত হয়ে যাবে, তখন আর হাহুতাশ করে কোনো লাভ হবে না।

হরফ যত অর্থ তত!

আরবি ভাষার একটি নিয়ম হলো, কাসরতুল মাবানি তাদুল্লু আলা কাসরতিল মাআনি। অর্থাৎ, একটি শব্দে হরফের সংখ্যা বাড়লে তার সাথে পাল্লা দিয়ে অর্থও বাড়বে। ফলে একই অর্থের এক ধরনের দু'টি শব্দের মধ্যে একটিতে কম আর অন্যটিতে বেশি হরফ থাকলে যে শব্দে হরফ বেশি আছে তা অর্থের দিক থেকে ব্যাপকতা লাভ করে। ইতিপূর্বে রহমান আর রহীম শব্দের আলোচনায় আমরা এটি দেখেছি।

এই ধরনেরই আরেকটি বিষয় এখন জানব। সূরা কাহফে মূসা ﷺ ও খাযির ﷺ-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে মূসা ﷺ তাঁর একজন সহচর-সহ খাযির ﷺ-এর কাছে আগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে শেখার আবেদন জানান। খাযির ﷺ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। তবে শর্তারোপ করেন যে, তিনি নিজ থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করার আগে তাঁর কোনো কর্ম সম্পর্কে আপত্তি করা যাবে না। কিন্তু মূসা ﷺ আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত-বিরোধী মনে হওয়ায় তাঁর কয়েকটি কর্মের ওপর আপত্তি করেন। একে একে তিনবার শর্ত ভঙ্গের ভুল করায় খাযির ﷺ তাকে নিজের থেকে পৃথক করে দেন।

মূসা ﷺ-এর পক্ষে খাযির ﷺ-এর কাজ দেখে বাহ্যিকভাবে আপত্তি না তুলে নিশ্চুপ থাকা যে সম্ভব হবে না, সেই কথা তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটা কুরআনে আলোচিত হয়েছে একই রকমের শব্দে; সামান্য তারতম্যের সাথে। এই তারতম্যের ভেতর দিয়েই কুরআনের অসাধারণ ভাষাগত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রথমবার তারা সফর শুরু করে একটি নৌকাতে আরোহণ করেন। মাঝ নদীতে যাওয়ার পর খাযির ﷺ নৌকাটি ফুটো করে দেন। বাহ্যিকভাবে এটি অন্যায় মনে হওয়ায় মূসা ﷺ চুপ করে থাকতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন একজন নবি।

আর নবিরা কখনো অন্যায় দেখে চুপ থাকেন না। যথাসাধ্য প্রতিবাদের চেষ্টা করেন। তাই তিনি আপত্তি তুলে বলেন, 'আপনি নৌকার আরোহীদের ডুবিয়ে মারার জন্য নৌকাটি ফুটো করে দিলেন?'

তাঁর মুখে এমন প্রশ্ন শুনে খাযির ﷺ বললেন,

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে থেকে সবর করতে পারবেন না!'[৯]

এখানে কথাটা যে তিনি মূসা ﷺ-কে বলেছেন সেটা আলোচনার ধারাবাহিকতা থেকেই বুঝে আসে। তিনি নরমালি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে...'

এরপর মূসা ﷺ শর্তের কথা বিস্মৃত হবার ওজর পেশ করে কঠোরতা আরোপ না করার আবেদন করেন। খাযির ﷺ তাঁর আবেদন মেনে নেন এবং তাকে নিয়ে আবার পথচলা শুরু করেন। এবার পথ চলতে চলতে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে তাদের সামনে পড়ল। খাযির ﷺ তাকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই হত্যা করে ফেলেন। এমন একটি নিরপরাধ ছেলেকে হত্যার দৃশ্য দেখে মূসা ﷺ এর নববি মেজাজ খামোশ থাকতে পারেনি। তিনি যথারীতি এই কাজের ওপর আপত্তি তুলে প্রতিবাদ করলেন। খাযির ﷺ প্রতিউত্তরে তাকে বললেন,

أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে থেকে সবর করতে পারবেন না!'[১০]

এখানে তিনি হুবহু আগের কথাই উল্লেখ করলেন। শুধু একটা 'লাকা' বাড়িয়েছেন, যার মানে হলো 'আপনাকে'। অর্থাৎ, আগের তুলনায় এইবার প্রতিউত্তরে তিনি আরেকটু জোর দিলেন এবং 'আপনি' শব্দটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন 'আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি সবর করতে পারবেন না; কিন্তু সেটা আপনি মানতে পারলেন না। এখন দেখলেন তো?

মূসা ﷺ এবার শেষ সুযোগ চাইলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে। যদি আমি আর কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না।'

তারা আবার চলতে শুরু করলেন। এবার একটা গ্রামে পৌঁছে সেখানকার লোকদের

[৯] সূরা কাহফ, ১৮ : ৭২।
[১০] সূরা কাহফ, ১৮ : ৭৫।

কাছে খাবার চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকার করল। এদিকে খাযির ﷺ সেই জনপদের ভগ্নপ্রায় একটি দেয়াল বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করে দিলেন। মূসা ﷺ তাঁর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে বলে ফেললেন, 'আপনি তো চাইলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন!'

এই কথা শুনে খাযির ﷺ বললেন,

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

'এবার আপনার আর আমার আলাদা হওয়ার পালা। তবে আমি অবশ্যই আপনাকে সেই রহস্যের কথা জানাব, আপনি যেই ব্যাপারে সবর করতে পারলেন না।'[১১]

এরপর তিনি তাঁর কাজগুলোর ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, 'আমি জাহাজটি ফুটো করে দিয়েছি; কারণ এটি ছিল কিছু মিসকীন ছেলের। তারা সুমুদ্রে এটা দিয়ে জীবিকানির্বাহ করত। সেখানে একজন যালিম বাদশাহ মানুষের নৌযান ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আমি এটি ত্রুটিযুক্ত করে দিয়েছি, যেন সে এটি ছিনিয়ে না নেয়। আর অল্প বয়সী ছেলেটিকে হত্যা করার কারণ হলো, তাঁর বাবা-মা মুমিন ছিল। সে বড় হয়ে তাদেরকে কুফরিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করার আশঙ্কা ছিল। তাই আমি তাকে মেরে ফেলি। এর পরিবর্তে আল্লাহ তাদেরকে আরও উত্তম সন্তান দান করবেন। আর সর্বশেষ যে দেয়াল মেরামত করে দিয়েছিলাম এর পেছনে রহস্য হলো, এটি ছিল সেই এলাকার কিছু ইয়াতীম ছেলের। তাদের বাবা ছিল সৎ। সেই দেয়ালের নিচে তিনি সন্তানদের জন্য কিছু সম্পদ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। তারা বড় হয়ে সে সম্পদ হস্তগত করা অবধি যেন তা নিরাপদ থাকে সেজন্য দেয়ালটা মেরামত করা।' ব্যাখ্যা প্রদান শেষে তিনি বললেন,

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

'এগুলো সেই কাজের ব্যাখ্যা, যেই বিষয়ে আপনি সবর করতে পারেননি।'[১২]

খাযির ﷺ স্বীয় কর্মের ব্যাখ্যা করার আগে ও পরে মূসা ﷺ-এর সবর করতে না পারার জন্য যে শব্দ নির্বাচন করলেন তা খেয়াল করুন। কাছাকাছি হলেও উভয়টার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটি জায়গায় সবর করতে না পারার বিষয়টির জন্য তিনি নির্বাচন করলেন—'লান তাসতাতীয়া' (لَنْ تَسْتَطِيعَ) এবং 'মা

[১১] সূরা কাহফ, ১৮ : ৭৮।

[১২] সূরা কাহফ, ১৮ : ৮২।

লামতাসতাতি' (مَا لَمْ تَسْتَطِعْ)। অর্থাৎ, এগুলোতে 'সীন'-এর পর একটি 'তা' আছে। আর ব্যাখ্যা শুনানোর পরে বললেন- 'মা লামতাসতি' (مَا لَمْ تَسْطِعْ)। এতে 'সীন'-এর পর 'তা' নেই। একটি হরফ কমে আসার দরুন অর্থের মধ্যেও কমতি চলে আসল। এমন করার কারণ হলো, কাজগুলোর ব্যাখ্যা করার আগ পর্যন্ত মূসা ﷺ-এর সবর করতে না পারার ব্যাপারটা গাড় ছিল। যেহেতু তিনি এর রহস্য তখন পর্যন্ত জানতেন না। তাই সেখানে বাড়তি একটা হরফ আনায় অর্থের মধ্যে আধিক্য আসে এবং উনার সেই সময়কার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। কিন্তু ব্যাখ্যা শুনার পর যেহেতু পুরো বিষয়টা তাঁর কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তাই তখন আর সবর করতে না পারার ব্যাপারটি আগের মতো গাড় ছিল না, হালকা হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য 'সীন'-এর পর 'তা' আনা হয়নি আর। এই একটি হরফ কম করে দেওয়ায় অর্থের মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে এবং সবর করতে না পারার ব্যাপারটা আগের তুলনায় হালকাভাবে উপস্থাপিত হয়।

এই সূরাতে যুলকারনাইনের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর ঘটনাতেও এমন একটি ভাষাগত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তিনি পূর্ব-পশ্চিম বিজেতা ছিলেন। ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে একটি জনপদের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তিনি লোহার পাত গলিয়ে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করেন। যাতে ওপাশ থেকে তারা এই জনপদে ঢুকে হামলা করতে না পারে। দেয়াল নির্মাণ শেষে তিনি বললেন,

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

> **'ইয়াজুজ-মাজুজ এই দেয়ালে চড়তে সক্ষম হবে না এবং তারা তা ফুটাও করতে পারবে না।'**[১৩]

এই আয়াতেও প্রথম শব্দটাতে 'তা' ছাড়াই বলা হলো 'মাসতাউ' (مَا اسْطَاعُوا)- তারা সক্ষম হবে না। পরের অংশে 'তা' বৃদ্ধি করে বলা হলো 'মাসতাতাউ' (مَا اسْتَطَاعُوا)- তারা সক্ষম হবে না। এই একটি হরফ বৃদ্ধি করার দরুন সক্ষম না হওয়ার অর্থে আধিক্য তৈরি হয়, যা প্রথমটাতে ছিল না। কারণ হলো, লোহার দ্বারা নির্মিত সেই দেয়ালে চড়তে পারা যতটা কঠিন, তা ফুটা করা ছিল আরও বেশি কঠিন। এভাবে বলার দ্বারা দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা প্রথমটার তুলনায় বেশি হওয়ার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

---

[১৩] সূরা কাহফ, ১৮ : ৯৭।